প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

কঞ্চি কলম পদ্ধতিতে বাঁশের চারা উৎপাদন, চারা রোপণ ও ঝাড় ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
ষোলশহর, চট্টগ্রাম
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
জুন, ২০২১

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

কঞ্চি কলম পদ্ধতিতে বাঁশের চারা উৎপাদন, চারা রোপণ ও ঝাড় ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

ষোলশহর, চট্টগ্রাম

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

জুন, ২০২১

প্রকাশকাল
জুন, ২০২১

প্রকাশক/ প্রকাশনায়
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

গ্রন্থস্বত্ত্ব
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

রচনায়
ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান
ড. ওয়াহিদা পারভীন
নুসরাত সুলতানা
জহিরুল ইসলাম
সাইফুল আলম মোঃ তারেক
সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগ

অর্থায়নে
টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প
বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর, বন ভবন
আগারগাঁও, ঢাকা।

মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ : তিশা এন্টারপ্রাইজ, ৩২ নারিন্দা, ঢাকা-১১০০।
ফোন : ০১৮১৯-২৯৯৪৩০।

সতর্কতা
সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত, যথাযথ কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বই বা এর কোন অংশ, কোন ফর্ম বা কোন উপায়ে, ইলেকট্রনিক বা যান্ত্রিক মাধ্যমে, ফটোকপি, রেকর্ডিং বা কোনও তথ্য ভান্ডারে সংরক্ষণ করা এবং পুনরুৎপাদন পদ্ধতি যা বর্তমানে জানা নেই বা যা ভবিষ্যতে আবিষ্কার হতে পারে সহ যেকোন মাধ্যমে পুনরুৎপাদন করা যাবে না।

বাণী

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) দেশের বন ও বনজ সম্পদের উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবহার বিষয়ক গবেষণার একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। বনজ সম্পদের সুষ্ঠু ও বিজ্ঞান সম্মত ব্যবহার বিষয়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালে "ফরেস্ট প্রোডাক্টস ল্যাবরেটরি" নামে প্রতিষ্ঠানটির পথ চলা শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৬৮ সালে বনজ সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গবেষণা শুরু করার মাধ্যমে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। বিএফআরআই এর মূল লক্ষ্য হলো দেশের বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি, সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সমূহ ভোক্তা পর্যায়ে সম্প্রসারণ।

বাংলাদেশ বন গবেষণ ইনস্টিটিউট এর গবেষণা কার্যক্রম বন ব্যবস্থাপনা ও বনজ সম্পদ উইং এর আওতায় ১৭টি গবেষণা বিভাগ, ০১টি শাখা এবং ২২টি ফিল্ড স্টেশনের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে উন্নত জাত ও গুণগত মানসম্পন্ন প্লান্টিং ম্যাটেরিয়াল উৎপাদন, বাঁশ, বেত, পাটিপাতা ও অন্যান্য অকাষ্ঠল বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সামাজিক বনায়ন ও সুষ্ঠু খামার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, বৃক্ষ প্রজনন ও উন্নয়ন, বন ব্যবস্থাপনা ও বনবাগান উত্তোলন পদ্ধতি, জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বনজ সম্পদের ইনভেন্টরি, বৃদ্ধি এবং উৎপাদন হার নিরূপন, বন মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও ওয়াটার শেড ব্যবস্থাপনা, বনব্যাধি ও কীট-পতঙ্গ ব্যবস্থাপনা, বনজ সম্পদের ভৌত ও রাসায়নিক ব্যবহার এবং বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন ও উদ্ভাবন বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটি গবেষণা পরিচালনা করছে। প্রতিষ্ঠানটির উদ্ভাবিত গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি সমূহ মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন ভোক্তা সংস্থাসহ ব্যক্তি পর্যায়ে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং প্রযুক্তি সমূহ সম্প্রসারণে বিভিন্ন সংস্থার সাথে যৌথভাবে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিএফআরআই, বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্পের সাথে যৌথ ভাবে প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং প্রকল্প এলাকায় বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয়বর্ধক কাজের সুযোগ বৃদ্ধি করা। প্রকল্পটি দেশের ২৮টি জেলার ১৬৫টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে বিএফআরআই, বন অধিদপ্তরের সাথে যৌথভাবে কাজ করছে। দেশের বনজ সম্পদের বৃদ্ধি, উন্নয়ন ও যথাযথ ব্যবস্থাপনার উপর বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সমূহ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এবং বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারি ও ব্যক্তি পর্যায়ের বন নির্ভর ভোক্তা গোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে **"কঞ্চি কলম পদ্ধতিতে বাঁশের চারা উৎপাদন, চারা রোপণ ও ঝাড় ব্যবস্থাপনা"** বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি প্রশিক্ষণার্থীসহ অন্যান্য ভোক্তাগোষ্ঠীর কাজে সহায়ক ও জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি প্রস্তুত করায় আমি সংশ্লিষ্ট গবেষণা বিভাগের গবেষকবৃন্দ এবং ম্যানুয়ালটির মুদ্রণ কাজে আর্থিক সহযোগিতার জন্য সুফল প্রকল্প, বন অধিদপ্তর এবং বিশ্ব ব্যাংক কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ড. রফিকুল হায়দার
পরিচালক
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
চট্টগ্রাম।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
সূচনা	১
বাঁশের ব্যবহার	১
বাঁশের সহজাত গুণাবলী	৩
বাংলাদেশে বাঁশের বর্তমান পরিস্থিতি	৩
বাংলাদেশে বাঁশের প্রকারভেদ	৩
বাঁশ চাষের বিভিন্ন পদ্ধতি	৫
অফসেট পদ্ধতির সাথে কঞ্চি কলমের তুলনা মূলক বিচার	৬
কঞ্চি কলম পদ্ধতির বিবরণ	৭
বাঁশের বয়স চেনার উপায়	৮
কঞ্চি কলম সংগ্রহকরণ	৯
বেডে কঞ্চি কলম রোপণ ও পরিচর্যা	৯
কঞ্চি কলম স্থানান্তরকরণ	১০
কঞ্চি কলম পদ্ধতির সম্ভাবনা	১৪
বাঁশ ঝাড় ব্যবস্থাপনা	১৫
বাঁশ চাষে বিভিন্ন প্রকারের পরিচর্যা	১৫
ঝাড় থেকে বাঁশ আহরণ	১৮
উৎপাদনের আয়-ব্যয়	২০
উপসংহার	২২

সূচনা

বাংলাদেশের একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদ বাঁশ। বন ও গ্রামাঞ্চলের গাছপালা সমূহের মধ্যে যে গাছের ব্যবহার সবচেয়ে অধিক তা সম্ভবত এ বাঁশ। খাদ্য ও বস্ত্রের সরবরাহকারী শস্যগুলোকে বাদ দিলে এদেশে বাঁশের মত এত উপকারী আর কোন উদ্ভিদ আছে কি না সন্দেহ।

বাঁশ মূলত এক ধরনের বহুবর্ষজীবী কাষ্ঠল ঘাস বিশেষ। অন্যান্য ঘাস থেকে বাঁশের একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বাহ্যিক গঠনাবলীর দিক থেকে বাঁশ গাছকে তিনটি অংশে ভাগ করা যায়। মাটির উপরের সরল অংশ, লম্বা এবং চোঙ্গাকৃতি কাঠের ন্যায় শক্ত সবুজ অংশ যা আমরা বিভিন্ন নির্মাণ কাজে ব্যবহার করে থাকি; মাটির নিচে স্থুল আনুভূমিক কান্ড বা মোথা এবং মোথার নিচে গুচ্ছ মূল। বৈজ্ঞানিকদের ধারনা মতে পৃথিবীতে প্রায় ১৫০০ থেকে ১৭০০ প্রজাতির বাঁশ রয়েছে। তার মধ্যে চীন ও ভারতেই রয়েছে অধিক সংখ্যক প্রজাতি। ভূমন্ডলের ৪৬ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ হতে ৪৭ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে বাঁশ গাছের প্রাকৃতিক বিস্তৃতি। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে পর্বতের উপরে তুষার রেখা পর্যন্ত বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশ প্রাকৃতিকভাবে জন্মাতে দেখা যায়। ইউরোপ মহাদেশ ছাড়া এশিয়া, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার কোন কোন বনাঞ্চলে বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশ প্রাকৃতিকভাবে জন্মায়। উপকূলীয় বনাঞ্চল ছাড়া মোটামুটিভাবে সকল গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চল ও কোন কোন ক্ষেত্রে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বাঁশ জন্মে। দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার প্রায় প্রতিটি দেশে বিভিন্ন জাতের প্রচুর বাঁশ প্রাকৃতিকভাবে জন্মে এবং চাষ করা হয়ে থাকে।

এদেশে বাঁশের বিপুল চাহিদার তুলনায় এর উৎপাদন খুবই সীমিত। এর একটি বড় কারণ বাঁশ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় চারা বা রোপণ সামগ্রীর অভাব এবং তার উচ্চ মূল্য। প্রচলিত নিয়মে বাঁশঝাড় থেকে সংগ্রহ করা বাঁশের অফসেট বা মোথা বাঁশ চাষের চারা রূপে ব্যবহৃত হয়। প্রায় একটি পূর্ণাঙ্গ বাঁশের মূল্য দিয়েই কিনতে হয় এ অফসেট। তাতে বাঁশ উৎপাদনের প্রথম পর্যায়েই চাষিকে একটি বড় রকমের ব্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। আবার এক একটি বাঁশ ঝাড় থেকে ২-৪টির অধিক অফসেট সংগ্রহ করা যায় না। এই অবস্থার প্রতিকার স্বরূপ বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্ভাবিত কঞ্চিকলম পদ্ধতিতে বাঁশের চারা উৎপাদন প্রযুক্তিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই পদ্ধতিতে এক একটি বাঁশ ঝাড় থেকে ২০০ এর অধিক চারা উৎপাদন করা যেতে পারে। প্রতিটি চারা অফসেটের প্রায় এক ষষ্ঠাংশ মূল্যে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ এ পদ্ধতি ব্যবহারে এদেশে স্বল্পমূল্যে বিপুল পরিমাণে চারা উৎপন্ন করে বাঁশের চাষ সম্প্রসারিত করা সম্ভব হবে।

বাঁশের ব্যবহার

বাঁশের রয়েছে অসংখ্য প্রকারের ব্যবহার, সেগুলোর মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটির কথা নিচে উল্লেখ করা হলো ঃ

- গ্রামের অধিকাংশ সাধারণ ঘর-বাড়ি নির্মাণের প্রধান উপকরণ বাঁশ। তাই একে 'গরীবের কাঠ' (Poorman's timber) নামে অভিহিত করা হয়। দালান-কোঠা নির্মাণের কাজে রাজমিস্ত্রীদের বাঁশের ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই।

- বাংলাদেশে প্রতি বছর নির্মাণ কাজে প্রায় ১০০ কোটি বাঁশ ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ এ খাতে বছরে মাথাপিছু ব্যবহারের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮/৯ টি বাঁশ।

- কৃষি কাজে বাঁশের বহুল ব্যবহার রয়েছে। চাষের যন্ত্রপাতি, বিভিন্ন প্রকারের শস্য ক্ষেতের এবং তরিতরকারি ও ফলমূলের বাগানের বেড়া, খুঁটি, লাউ-কুমড়া, শসা, শিমের মাচা, কলা গাছের ঠেঁশ, পানের বরজ, শস্যের গোলা ও ঝাঁপি ইত্যাদিতে বাঁশ ছাড়া চলে না। মাছ ধরার বড়শি, ফাঁদ, চাঁই এসবের জন্যেও বাঁশের প্রয়োজন।

- বহু প্রকারের আসবাবপত্র বাঁশ ও বেতের সমন্বয়ে তৈরি হয়। ঝাঁপি, টুকরি, কুলা ও ছাতার কাঠামো বানাতে এবং অন্যান্য বহু কুটির শিল্পে রয়েছে বাঁশের ব্যবহার।
- কাগজ তৈরি শিল্পে কাঁচামাল হিসেবেও আছে বাঁশ। বাংলাদেশে চন্দ্রঘোনার কাগজ ও মন্ড কারখানায় প্রতিদিন প্রায় ১২৫ টন বাঁশ ব্যবহৃত হয়।
- আজকাল অগভীর নলকুপ এর পাইপ বা নলও বানানো হয় তল্লা ও মাকলা বাঁশ দিয়ে।
- নদী-নালা ও খাল-বিলের এই বাংলাদেশে বাঁশের সাঁকো না হলে চলে না।
- সব ধরনের বাঁশই জ্বালানীরূপে কাজে লাগে।
- বাঁশের বাঁশির সুরে ভেসে উঠে এদেশের মানুষের সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরহের অভিব্যক্তি।
- এমন কি খাদ্য হিসেবেও বাঁশের ব্যবহার আছে। এদেশে পাহাড়ী এলাকায় এবং মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, তাইওয়ান, জাপান ও কোরিয়াতে বাঁশের কচি কোঁড়ল দিয়ে নানা প্রকার সুস্বাদু খাবার তৈরি করা হয়। বিদেশের বাজারে খাদ্যরূপে ব্যবহারের জন্য বাঁশের কোঁড়লের চাহিদা রয়েছে। এটি চীন ও ফিলিপাইনে একটি রপ্তানিযোগ্য পণ্যরূপে স্বীকৃত।

চিত্র ঃ রাঙামাটি পার্বত্য জেলার স্থানীয় বাজারে বাঁশের কোড়ল (Young bamboo shoot) বিপনন।

চিত্র ঃ বাঁশের তৈরি চেয়ার-টেবিল ও দরজা।

বাঁশের সহজাত গুণাবলী

বাঁশের সহজাত গুণাবলী বাঁশকে এতটা ব্যবহারোপযোগী করে তুলেছে। এ সবের মধ্যে নিম্নোক্ত গুণাবলী সমূহ উল্লেখ করার মত ঃ

- স্থিতিস্থাপকতা বা বক্রকরণের উপযোগিতা।
- সোজা ও অনেক ক্ষেত্রে লম্বা কান্ড।
- বাঁশের হালকা অথচ দৃঢ় ও শক্ত গড়ন।
- দৈর্ঘ্য ও বেড়ের বিভিন্নতা।
- অতি দ্রুত বর্ধনশীলতা (২ থেকে ৩ মাসে ৮-৩৫ মিটার দীর্ঘ হওয়া) এবং সহজলভ্যতা।
- কাগজের মন্ড তৈরিতে ব্যবহারের উপযোগিতা (অধিক সেলুলোজ ও ফাইবার থাকার কারণে)।

বাংলাদেশে বাঁশের বর্তমান পরিস্থিতি

দেশের এত প্রয়োজনীয় এই বাঁশের ব্যবহারিক চাহিদা বিপুল। বর্তমানে বছরে প্রায় ১০ লক্ষ টন শুকনো বাঁশ বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর মধ্যে গ্রাম থেকে আসে প্রায় ৮ লক্ষ টন এবং বনাঞ্চল থেকে আসে প্রায় ২ লক্ষ টন। অর্থাৎ বাঁশের প্রয়োজনের ৫ ভাগের ৪ ভাগই পূরণ হয় গ্রামাঞ্চলের উৎপাদিত বাঁশ থেকে।

- কিন্তু বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য বাঁশের যে চাহিদা তার তুলনায় উৎপাদন কম। উৎপাদন কম হওয়ার কারণে বাঁশের সংগ্রহ কম, মূল্য আগের চেয়ে অনেক বেশি।
- কুটির শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপকরণের দুষ্প্রাপ্যতা ও মূল্য বৃদ্ধির সাথে বাঁশ সংগ্রহের সংকটও হাতে হাত মিলিয়েছে। দেশের কতগুলো এলাকায়, যেমনঃ যশোর, নওয়াপাড়া, নড়াইল, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও চুয়াডাঙ্গা জেলায় বাঁশ ও বেত শিল্পে নিয়োজিত প্রায় ৪০ হাজার শ্রমিক তাদের পৈত্রিক ব্যবসা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে।
- বাঁশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজন বাঁশের উৎপাদন বৃদ্ধি।
- বাঁশের স্থায়িত্ব বা সংরক্ষণশীলতা বাড়াতে পারলে বাঁশের সরবরাহ সংকট দূরীভূত হবে।

বাংলাদেশে বাঁশের প্রকারভেদ

বাঁশের উৎপত্তিস্থল, বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান, বাঁশের কান্ডের প্রাচীরের পুরুত্ব এবং দৈহিক আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশকে বিভিন্ন গ্রুপ বা শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে ঃ

(ক) উৎপত্তিস্থল অনুসারে বাংলাদেশের বাঁশ প্রজাতিগুলোকে মূলত ২টি গ্রুপে ভাগ করা হয়-

১। দেশীয় প্রজাতি (Endemic Species) ঃ যে সকল প্রজাতির বাঁশ আমাদের দেশের বিভিন্ন বনাঞ্চল বা গ্রামীণ জনপদে প্রাকৃতিকভাবে জন্মায় বা পাওয়া যায়, তাদেরকে দেশীয় প্রজাতির বাঁশ বলা হয়। যেমন- বাইজ্জ্যা বাঁশ (*Bambusa vulgaris*), ফারুয়া বাঁশ (*Bambusa polymorpha*) ইত্যাদি।

২। বহিরাগত বা বিদেশীয় প্রজাতি (Exotic Species) ঃ যে সকল প্রজাতির বাঁশ বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে সংগ্রহ করে আমাদের দেশে চাষ করা হয়েছে, তাদেরকে বিদেশীয় প্রজাতির বাঁশ বলা হয়। এ সকল বাঁশ উদ্যানে এবং বসত বাড়িতে শোভাবর্ধনের জন্য লাগানো হয়। যেমন- রেঙ্গুন বাঁশ (*Thyrsostachys oliveri*)।

(খ) বিস্তৃতি ও প্রাপ্তির ধরন অনুসারে বাংলাদেশের বাঁশ প্রজাতিগুলোকে ৩টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়-

১। বনজ বাঁশ (Forest Bamboo) ঃ যে সকল প্রজাতির বাঁশ আমাদের দেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে জন্মাতে দেখা যায়, তাদেরকে বনজ বাঁশ বলা হয়। যেমন- মুলি বাঁশ (*Melocanna baccifera*), ডলু বাঁশ (*Schizostachyum dullooa*), তল্লা বাঁশ (*Bambusa tulda*) ইত্যাদি।

২। গ্রামীণ বাঁশ (Village Bamboo) ঃ যে সকল প্রজাতির বাঁশ মূলত গ্রামীণ জনপদে জন্মায় বা চাষ হয় তাদেরকে গ্রামীণ বাঁশ বলা হয়। যেমন- বরাক বাঁশ (*Bambusa balcooa*), বাইজ্জ্যা বাঁশ (*Bambusa vulgaris*) ইত্যাদি।

৩। উদ্যানীয় বা অলংকারিক বাঁশ (Garden or Ornamental Bamboo) ঃ যে সকল প্রজাতির বাঁশ মূলত বিভিন্ন উদ্যান, বিনোদনমূলক পার্ক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বসত বাড়িতে শোভাবর্ধনের জন্য লাগানো হয়েছে, তাদেরকে উদ্যানীয় বা অলংকারিক বাঁশ বলা হয়। যেমন- ঘটি বাঁশ (*Bambusa ventricosa*), সোনালি বাঁশ (*Bambusa vulgaris* var. *striata*) ইত্যাদি।

(গ) বাঁশ কান্ডের প্রাচীর বা অন্তঃত্বকীয় পুরুত্বের উপর ভিত্তি করে বাঁশ প্রজাতিগুলোকে ২টি ভাগে ভাগ করা হয়-

১। পুরু ত্বক/প্রাচীরযুক্ত বাঁশ বা মোটা বাঁশ (Thick Walled Bamboo) ঃ যে সকল প্রজাতির বাঁশের কান্ডের প্রাচীরের বা অন্তঃত্বকীয় পুরুত্ব বেশি (১৫-২৫ মিলিমিটার), তাদেরকে পুরু প্রাচীরযুক্ত বাঁশ বা মোটা বাঁশ বলা হয়। এ ধরনের বাঁশের পুরো কান্ড জুড়ে গিঁট বা পর্বসন্ধিগুলোর (Nodes) সংখ্যা বেশি এবং ঘনভাবে বিন্যস্ত। এদের পর্বমধ্য (Internodes) বা গিঁটগুলোর মধ্যবর্তী দৈর্ঘ্য কম (২০-৪০ সেন্টিমিটার) বিধায় বাঁশগুলো বেশ শক্ত এবং মোটা ধরনের হয়ে থাকে। গ্রামগঞ্জে বরাক, বেথুয়া, ভুদুম, মাকলা ও কাঁটা ইত্যাদি বাঁশ পাওয়া যায়। এসব বাঁশের ছিদ্র সরু ও দেয়াল মোটা।

২। পাতলা ত্বক/প্রাচীরযুক্ত বাঁশ বা পাতলা বাঁশ (Thin Walled Bamboo) ঃ যে সকল প্রজাতির বাঁশের কান্ডের প্রাচীরের পুরুত্ব বা অন্তঃত্বকীয় পুরুত্ব তুলনামূলকভাবে কম (৫-১০ মিলিমিটার), তাদেরকে পাতলা প্রাচীরযুক্ত বাঁশ বা পাতলা বাঁশ বলা হয়। এ ধরনের বাঁশের পুরো কান্ড জুড়ে গিঁট বা পর্বগুলোর (Nodes) সংখ্যা কম এবং পাতলাভাবে বিন্যস্ত। এদের পর্বমধ্য (Internodes) বা গিঁটগুলোর মধ্যবর্তী দূরত্ব বা দৈর্ঘ্য বেশি (৩০-৬০ সেন্টিমিটার) বিধায় বাঁশের প্রজাতিগুলো কম শক্ত এবং পাতলা ধরনের হয়ে থাকে। আমাদের দেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলে মুলি, মিতিঙ্গা, ডলু ইত্যাদি বাঁশ পাওয়া যায়। এসব বাঁশের ছিদ্র মোটা ও দেয়াল পাতলা।

(ঘ) বাঁশের উচ্চতা ও কান্ডের ব্যাসের উপর ভিত্তি করে বাঁশ প্রজাতিগুলোকে ৪টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়-

১। বড় বাঁশ (Large Bamboo) ঃ যে সকল প্রজাতির বাঁশ উচ্চতায় বা লম্বায় ১৮-৩০ মিটার এবং কান্ডের ব্যাস ৬-১৫ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে, তাদেরকে বড় বাঁশ বলা হয়। যেমন- বরাক বাঁশ (*Bambusa balcooa*), বাইজ্জ্যা বাঁশ (*Bambusa vulgaris*), ভুদুম বাঁশ (*Dendrocalamus giganteus*), কাঁটা বাঁশ (*Bambusa bambos*) ইত্যাদি।

২। **মাঝারি বাঁশ (Medium Bamboo)** ঃ যে সকল প্রজাতির বাঁশ উচ্চতায় বা লম্বায় ৬-২০ মিটার এবং কান্ডের ব্যাস প্রায় ৮ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে, তাদেরকে মাঝারি বাঁশ বলা হয়। যেমন- তল্লা বাঁশ (*Bambusa tulda*), মিতিঙ্গা বাঁশ (*Bambusa burmanica*), মাকলা বাঁশ (*Bambusa nutans*), ওরা বাঁশ (*Dendrocalamus longispathus*) ইত্যাদি।

৩। **ছোট বাঁশ (Small Bamboo)** ঃ যে সকল প্রজাতির বাঁশ উচ্চতায় বা লম্বায় ৪-৮ মিটার এবং কান্ডের ব্যাস প্রায় ৫ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে, তাদেরকে ছোট বাঁশ বলা হয়। যেমন - চই বাঁশ (*Bambusa multiples*), ঘটি বাঁশ (*Bambusa ventricosa*), কনককাইচ বাঁশ (*Bambusa comillensis*), টেংরা বাঁশ (*Bambusa jaintiana*) ইত্যাদি।

৪। **আরোহী বা লতানো বাঁশ (Climbing Bamboo)** ঃ যে সকল প্রজাতির বাঁশ আরোহী বা লতানো স্বভাবের, অন্য বড় গাছকে অবলম্বন করে বেড়ে ওঠে এবং কান্ডের ব্যাস প্রায় ৫ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে, তাদেরকে আরোহী বা লতানো বাঁশ বলা হয়। যেমন - লতা বাঁশ (*Melocalamus compactiflorus*).

বাঁশ চাষের বিভিন্ন পদ্ধতি

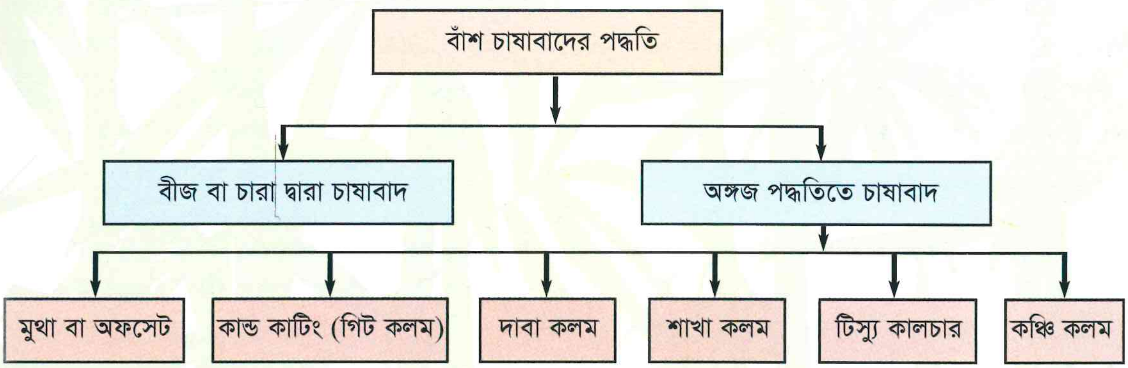

বাঁশ চাষ বা বাঁশ ঝাড়ের বিস্তার প্রধানত ২ ভাবে করা যেতে পারে- (১) বীজের সাহায্যে (২) অঙ্গজ পদ্ধতিতে।

(১) বীজের সাহায্যে

অন্যান্য বহু শস্য ও গাছপালার মত বীজের মাধ্যমে বাঁশেরও বংশ বিস্তার হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক নিয়মে এক একটি বাঁশ ঝাড় থেকে অসংখ্য বীজ মাটিতে পড়ে এবং অনুকূল পরিবেশ পেলে তা থেকে অনেক চারা গজায়। এতে সহজেই অনেক চারা পাওয়া যায়। কিন্তু ঝাড়ের বয়স জাত বিশেষে ২৫-৪০ বছর হওয়ার পরেই কেবল ঝাড়ে জন্মানো বাঁশগুলোতে ফুল ধরে তা থেকে বীজ উৎপন্ন হয়। তবে প্রতি বছর বাঁশে ফুল আসে না, প্রজাতি ভেদে ২৫-৪০ বছর পর পর ফুল আসে এবং ফুল থেকে ফল হওয়ার পর পুরো বাঁশ ঝাড় মরে যায়। ফলে, একদিকে যেমন কোন চাষির পক্ষে বাঁশ চাষের জন্য এত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করা সম্ভব নয়, অপরদিকে তেমন বীজ জন্মানোর সময়, স্থান ও প্রজাতির দিক থেকেও সুনিশ্চিত নয়। এছাড়া, এদেশের গ্রামাঞ্চলের দুটি প্রধান বাঁশ প্রজাতি বরাক ও বারিয়ালা বাঁশের ফুল ফুটলেও তা থেকে বীজ হয় না। বনাঞ্চলের বাঁশের প্রধান প্রজাতি মুলি বাঁশে বীজ উৎপন্ন হয়ে থাকে। তাই গ্রামাঞ্চলের বাঁশ-চাষ কর্মসূচিতে, বিশেষ করে ভিটে বাড়ীতে বাঁশ জন্মানোর বেলায় বীজের চারা ব্যবহার করা সম্ভব হয় না।

(২) অঙ্গজ পদ্ধতিতে

- **মোথা বা অপসেট পদ্ধতি**

মাটির নিচে বাঁশের কন্দকে প্রচলিত ভাষায় মোথা বলে। একটি বাঁশের গোড়ার দিকে ৩-৪টি গিঁটসহ মাটির নিচে মোথাকে অফসেট বলে। এ অফসেট লাগালে তা থেকে নতুন বাঁশ গজায়। বাঁশের অফসেট সংগ্রহ করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বাঁশের বয়স ১-৩ বছরের বেশি না হয়। এ বয়সের বাঁশের মোথার রঙ হয় হালকা হলুদ এবং গায়ের কুঁড়িগুলো পুষ্ট থাকে। অফসেটের জন্য নির্বাচিত বাঁশ অবশ্যই সতেজ ও স্বাস্থ্যবান হওয়া উচিত। অফসেটের পর্বসন্ধির কুঁড়িগুলো যেন জীবন্ত হয় এবং সংগ্রহের সময় যেন আঘাতপ্রাপ্ত না হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। অফসেট সংগ্রহকালে মোথা যেন কোনোভাবে আঘাত না পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অফসেট সংগ্রহের জন্য প্রকৃত সময় হলো চৈত্র মাস। বাংলাদেশ, ভারত, বার্মা, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া সহ দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রায় সব দেশেই অফসেট বা মোথার সাহায্যে বাঁশের চাষ হয়ে আসছে। বরাক, বারিয়ালা, মাকলা, জাই প্রভৃতি লম্বা, মোটা ও ভারী প্রজাতির বাঁশের চাষবাসে অফসেট রোপণ করাই হচ্ছে প্রচলিত রীতি। এটা আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত সর্বজন স্বীকৃত পদ্ধতি রূপে চালু রয়েছে।

- **গিঁট কলম পদ্ধতি**

বাঁশের কান্ডকে টুকরো টুকরো করে চারা তৈরির পদ্ধতিকে গিঁট কলম পদ্ধতি বলে। ১-৩ বছর বয়সের সুস্থ-সবল সদ্য কাটা বাঁশকে ১, ২ বা ৩ গিঁট লম্বা খন্ডে বিভক্ত করে চৈত্র-বৈশাখ মাসে অস্থায়ী বেডে লাগাতে হবে। বাঁশ টুকরো করার সময় আগার চিকন অংশ এবং গোড়ার অংশ কেটে ফেলে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বাঁশের টুকরোর গিঁটের কুঁড়ি সতেজ ও অক্ষত থাকে। প্রজাতিভেদে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের মধ্যে শতকরা ১৫-৫৫ ভাগ কুঁড়িতে শিকড় বের হয়।

- **দাবা কলম বা গ্রাউন্ড লেয়ারিং**

স্বল্প সংখ্যক বাঁশ ঝাড়ের চাষ করার জন্য দাবা কলম বা লেয়ারিং করা যেতে পারে। ঝাড়ের ১ বা ২ বছর বয়সের বাঁশ কঞ্চিসহ মাটিতে ৩০ থেকে ৪০ সেন্টিমিটার গভীর নালা কেটে শুইয়ে বালি মিশ্রিত মাটি চাপা দিয়ে রাখলে ঐ বাঁশের মাঝা-মাঝি জায়গায় বেশ কয়েকটি গিঁটে কঞ্চির গোড়ায় শিকড় গজিয়ে থাকে। বৃষ্টি না হলে ঝাড়ের গোড়ায় ও দাবা কলমের উপর ঘন ঘন পানি দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। বারিয়ালা, বরুয়া, তল্লা ইত্যাদি বাঁশের দাবা কলম ভাল হয়। বৈশাখ মাসের প্রথম দিকই দাবা কলম করার উৎকৃষ্ট সময়। পরের বছর জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে সেগুলো সতর্কতার সাথে মাটি খুড়ে সংগ্রহ করে সোজাসুজি মাঠে লাগিয়েও বাঁশ চাষ করা যায়।

- **কঞ্চি কলম পদ্ধতি**

এতকাল ধরে বাঁশের অফসেট বা মোথাই নতুন বাঁশ জন্মানোর উৎস বা চারারূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সাম্প্রতিক কালে গবেষকদের দৃষ্টি পড়েছে বাঁশের অন্য একটি অঙ্গের দিকে যা ব্যবহার করেও নতুন বাঁশের উৎপত্তি ঘটানো সম্ভব। এই অঙ্গটি হচ্ছে বাঁশের গিঁট থেকে উৎপন্ন কঞ্চি। দেখা গেছে যে, এই কঞ্চির গোড়াতে যদি শিকড় গজিয়ে নেওয়া যায় তাহলে শিকড়সহ সেই কঞ্চি রোপণ করেও বাঁশ জন্মানো সম্ভব হতে পারে। শিকড়-সহ কঞ্চিকেই বলা হয় প্রাকমূল কঞ্চি কলম। এর আকার ছোট হয়ে থাকে।

অফসেট পদ্ধতির সাথে কঞ্চি কলমের তুলনামূলক বিচার

অফসেট বা মোথা রোপণ পদ্ধতির তুলনায় কঞ্চি কলমের চারা রোপণের পদ্ধতি অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। কঞ্চি কলমের মাধ্যমে বাঁশ চাষের সুবিধাগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো ঃ

- প্রতি বাঁশ-ঝাড় থেকে বহুগুণ চারা পাওয়া যায়।
- কঞ্চি কলমের উৎপাদন খরচ বহুলাংশে কম।
- কলম ছোট আকারের হওয়াতে চারা প্রতি পরিবহন খরচ অনেক কম।
- কলমের পরিবহণজনিত ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা কম।
- বছরের প্রায় যে কোন সময়েই কঞ্চি কলম কম-বেশি করা যায়।

তবে অফসেট দিয়ে বাঁশ চাষ করলে, কঞ্চি কলমের তুলনায় অপর দু'একটি সুবিধা পাওয়া যায়, সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

অফসেট দিয়ে বাঁশ চাষ করলে তা একটি ঝাড়ে পরিণত হতে কঞ্চি কলম অপেক্ষা কম সময় লাগে। অফসেটের বেলায় ৪-৫ বছর, কঞ্চি কলমের বেলায় ৫-৭ বছর। অবশ্য, এর পরে বাঁশগুলোর বৃদ্ধির হারে আর তেমন কোন পার্থক্য দেখা যায় না।

সবদিক বিবেচনা করলে কঞ্চি কলম পদ্ধতিই যে সর্বোতভাবে গ্রহণযোগ্য এবং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহারযোগ্য তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। একটু মনোযোগ সহকারে কাজ করলে উৎসাহী চাষিরা নিজেরাই তাদের নিজ নিজ বাঁশ ঝাড় থেকে নতুন নতুন চারা কঞ্চি কলমের মাধ্যমে তৈরি করে নিতে পারবেন।

কঞ্চি কলম পদ্ধতির বিবরণ

বাঁশের কঞ্চির গোড়ায় শিকড় গজানোর পর উন্নত পদ্ধতির মাধ্যমে শিকড়সহ কঞ্চিকে রোপনের উপযোগী চারায় পরিণত করাকে কঞ্চি কলম পদ্ধতি বলা হয়। বংশগতি অপরিবর্তিত রেখে কঞ্চি কলমের মাধ্যমে বাঁশের দ্রুত বংশ বিস্তার করা যায়। এটি একটি লাগসই প্রযুক্তি যা বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত। বাঁশ চাষের জন্য নার্সারিতে সহজেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক কঞ্চি কলম উৎপাদন করা যায়। তবে বাঁশের সব প্রজাতিতে কঞ্চি কলম উৎপাদন করা যায় না। বাইজ্জ্যা, বরাক, ফারুয়া, ঘটি, সোনালি, ভুদুম প্রভৃতি প্রজাতির বাঁশের কান্ডের দেয়াল/প্রাচীর পুরু বিধায় এগুলোর কঞ্চিগুলো কলমজাত চারা উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত।

বাঁশের কঞ্চি কলম উৎপাদনের কলা-কৌশল এবং পদক্ষেপসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ

- **প্রোপাগেশন বেড তৈরি**

প্রোপাগেশন বেড স্থাপনের জন্য ৩ প্রকারের স্থান নির্বাচন করা যেতে পারে। এগুলো হচ্ছে- (১) সমতল জমির উপর নির্মিত বেড (২) পাকা মেঝের উপর নির্মিত বেড এবং (৩) মাটির উপরে নির্মিত বেড। কোথায় বেড তৈরি হবে সেটা একজন চাষির বা নার্সারি মালিকের সুবিধামতো নির্বাচন করে নিলেই হবে।

সরাসরি সমতল জমি কিংবা পাকা মেঝের উপরে বেড নির্মাণ করতে গেলে, বেডের চারদিকে ইট দিয়ে ৩-৪ ইট পরিমাণ উঁচু সীমানা তৈরি করে নিতে হবে। অপর পক্ষে, চাষযোগ্য জমিতে মাটির ভিতরে বেডের বেলায় ৩০-৪০ সেন্টিমিটার গভীর করে মাটি খুঁড়ে নিতে হবে। সেখানে প্রথমে মোটা মোটা পাথর দিয়ে ৭-১০ সেন্টিমিটার উঁচু একটি বাড়তি স্তর সাজিয়ে নিতে হবে। এর উপরে নিম্নোক্ত ৩টি স্তরে ৩ প্রকারের বালি দিয়ে মাটির স্তর সাজাতে হবে-

* **বালির স্তর**

নার্সারি বেড তৈরির জন্য ৩টি স্তরে যে ৩ প্রকারের বালি ব্যবহৃত হবে সেগুলো নিম্নরূপ-

(১) নিচের স্তরে মোটা কাঁকর কিংবা পাথর

(২) মধ্যস্তরে মাঝারি দানার বালি এবং

(৩) উপরের স্তরে মিহি দানার বালি।

চিত্র ঃ বালুর তৈরি প্রোপাগেশন বেড।

বালির প্রতিটি স্তর ৭-১০ সেন্টিমিটার পুরু হবে। তাতে নার্সারি বেডটি মোট ২১-৩০ সেন্টিমিটার পুরু হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, মাটির ভিতরের বেডের বেলায় স্তর হবে ৩টির স্থলে ৪টি। কাজের সুবিধার জন্য ১-২ মিটার চওড়া এবং ১২ মিটার লম্বা প্রোপাগেশন বেড তৈরি করা যেতে পারে।

* **বালি ধৌতকরণ**

বেড তৈরির আগে, অর্থাৎ বালি স্তরে স্তরে সাজানোর আগে, সেগুলো ভাল করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। কারণ বালিতে মাটি কিংবা জৈব-পদার্থ থাকলে বেড থেকে পানি সরতে দেরি হয়। ফলে বেডের নিচে ধীরে ধীরে জলাবদ্ধ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এতে কলম পচে যাবার আশঙ্কা থাকে। ধুয়ে পরিষ্কার করা বালিগুলো বেডে স্তরে স্তরে সাজাতে হবে। প্রথমে মোটা কাঁকর বা পাথর দিতে হবে, এরপর মাঝারি দানার বালি এবং সবচেয়ে উপরে মিহি দানার বালি স্থাপন করতে হবে।

বাঁশের বয়স চেনার উপায় (কঞ্চি ও সিথপত্রের অবস্থা অনুযায়ী)

বাঁশে কঞ্চির সৃষ্টি অথবা বৃত্তান্ত জানা থাকলে ঝাড়ের মধ্যে বিভিন্ন বয়সের বাঁশ চেনা সহজ হয়। এ ব্যাপারে মোটামুটি ধারণা থাকলে তা বাঁশ-ঝাড়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিচর্যায় সহায়ক হয়। কিভাবে একটি ঝাড়ে বিভিন্ন বয়সের বাঁশ চেনা যাবে, তার কিছু বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলো-

বয়স	বয়স চেনার উপায়
এক বছরের কম বয়স	বাঁশের অধিকাংশ গিঁটে খোলস থাকবে, গিঁটে কঞ্চি গজাবে না, বাঁশ গাঢ় সবুজ রং হবে।
এক বছর থেকে বেশি দুই বছরের কম বয়স।	বাঁশের কিছু গিঁটে তখনও খোলস থাকবে, প্রায় প্রতি গিঁটেই কঞ্চি গজায় এবং কঞ্চিতে পাতা বের হয়।
দুই বছর থেকে বেশি তিন বছরের কম বয়স	বাঁশের গোড়ার দিক হতে প্রায় সব গিঁটের খোলস ঝড়ে যায়, কঞ্চি গুলো শক্ত হয় এবং বাঁশের রং কিছুটা ফ্যাকাসে হয়ে যায়।
তিন বছরের উর্ধ্বে	বাঁশ সবুজ বর্ণ থেকে পরিবর্তিত হয়ে কিছুটা হলুদ বর্ণ ধারন করে এবং বাঁশের রং অনেকটা বাদামী মরিচা রং হয়ে যায়।

কঞ্চি কলম সংগ্রহকরণ

- কঞ্চি কলম সংগ্রহের জন্য বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস সবচেয়ে ভালো সময়।
- কলম কাটার জন্য সুস্থ, সবল, অপেক্ষকৃত মোটা আকৃতির ১-২ বছর বয়সের বাঁশ নির্বাচন করতে হবে।
- বাঁশের গা ঘেঁষে হাতের আঙ্গুলের মত মোটা কঞ্চি হাত করাত দিয়ে কেটে সংগ্রহ করতে হবে।
- কঞ্চির গোড়া হতে ৩-৫ গিঁট বা দেড় হাত লম্বা করে কঞ্চি কলমের সাইজ হবে।
- সংগৃহীত কঞ্চি কলমগুলি পূর্বে তৈরিকৃত প্রোপাগেশন বেডে লাগানোর পূর্ব পর্যন্ত এগুলোকে একটি পানিসহ বালতিতে সংগ্রহ করতে হবে অথবা ভেজা চট দিয়ে মুড়িয়ে ছায়াযুক্ত স্থানে ভিজিয়ে রাখতে হবে। এতে করে কঞ্চির গোড়ার শিকড় শুকাবে না।
- অক্টোবর-ফেব্রুয়ারি (কার্তিক-মাঘ) মাস বাদে সারা বছরই কঞ্চি কলম করা যায়। মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর মাস (বৈশাখ-আশ্বিন) কঞ্চি কলম তৈরির উপযুক্ত সময়।

চিত্র ঃ কঞ্চি কলম সংগ্রহ।

বেডে কঞ্চিকলম রোপণ ও পরিচর্যা

১) কঞ্চির ডালপালা ও পাতা ছাটাই ঃ বালতিতে করে নিয়ে আসা কঞ্চি কলম গুলোকে মাটিতে নামিয়ে, সেগুলোর ডালপালা ও আগার দিকের পাতা ছেটে ফেলতে হবে। এতে কঞ্চি থেকে জলীয় অংশ নির্গত হওয়া কমে যাবে, তাতে চারা সহজে শুকিয়ে যাবে না।

২) কঞ্চি কলম রোপণ ঃ এবারে কঞ্চিগুলোকে বেডে রোপণ করতে হবে। এগুলোকে স্থাপনের জন্য পারস্পরিক দূরত্ব হবে ২-৩ সেন্টিমিটার এবং রোপণের গভীরতা হবে ৭-১০ সেন্টিমিটার। রোপণ করে কঞ্চির গোড়াতে আঙ্গুল দিয়ে একটু চাপ দিতে হবে, যাতে তা ঠিকমতো দাঁড়িয়ে থাকে। বাতাসে কঞ্চি নড়লে শিকড় গজাতে দেরী হবে।

চিত্র ঃ বেডে কঞ্চি কলম রোপণ ও পরিচর্যা।

৩) পানি সেচ ঃ রোপণের পর বেডে প্রতিদিন ৫-৬ বার পানি ছিটিয়ে দিতে হবে। পানি ছিটানোর কাজটি প্রায় ১ মাস ধরে চলবে। শেষের ১৫ দিন দৈনিক ২ বার (সকালে ও বিকালে) পানি সেচ দিতে হবে।

কঞ্চি কলম স্থানান্তরকরণ

১) কঞ্চি কলম স্থানান্তরের জন্য উপযুক্ত হওয়া

বেডে লাগানোর মাস খানেকের মধ্যে অর্থাৎ আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে কঞ্চির গোড়ায় মোথা ও প্রচুর সংখ্যক শিকড় সৃষ্টি হবে। শিকড়গুলো বেশ দীর্ঘ হবে। এটিই হচ্ছে কঞ্চি কলমের প্রোপাগেশন বেড থেকে স্থানান্তরকরণের জন্য উপযুক্ত অবস্থা।

২) কঞ্চি কলম স্থানান্তর

প্রোপাগেশন বেডে কঞ্চি কলমগুলোকে পরিচর্যা করে সেগুলোতে নতুন নতুন প্রচুর শিকড় গজিয়ে নেওয়া ও মোথাকে পোক্ত করার পর রোপণের স্থান পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে রোপণের উপযোগী অবস্থায় রোপণ করার পূর্ব পর্যন্ত কয়েকটি কাজ করতে হবে। এসব কাজের মধ্যে রয়েছে

- পলিব্যাগে মাটি ভরা,
- বালির বেড হতে কলম তুলে নিয়ে ধৌত করা,
- পলিব্যাগে কলম রোপণ করা,
- ব্যাগগুলোকে ছায়ায় স্থাপন ও কিছুদিন ধরে সেখানে রাখা,
- ব্যাগগুলোকে নার্সারির উন্মুক্ত স্থানে রোদে নিয়ে আসা এবং
- সেখানে রেখেই কলমে নতুন কোঁড়ল গজানোর সুযোগ প্রদান করা।

৩) পলিব্যাগে মাটি ভরা

কঞ্চি কলমগুলোকে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে নার্সারি বেড থেকে সরিয়ে পলিব্যাগে রোপণ করা হয়। এজন্য একটি পলিব্যাগে একটি করে কলম স্থাপন করতে হয়। পলিব্যাগের আকার হবে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতায় ১৫-২০ সেন্টিমিটারের মতো। পলিব্যাগে যে সার মিশ্রিত মাটি ভরা হবে, তাতে ৩ ভাগ মাটি ও ১ ভাগ গোবর সার থাকবে।

চিত্র ঃ পলিব্যাগে মাটি ভরা।

৪) কঞ্চি কলম প্রোপাগেশন বেড থেকে তুলে ধৌত করা

কঞ্চি কলমগুলোকে শিকড়সহ বালি থেকে আস্তে আস্তে তুলে নিতে হবে। সেগুলোকে কোন গামলা বা বালতির পানিতে ধীরে ধীরে নাড়াচাড়া করতে হবে। এ ভাবে কলমের গোড়ার বালি ধুয়ে চলে যাবে।

চিত্র ঃ শিকড়সহ কঞ্চি কলম।

৫) পলিব্যাগে চারা রোপণ

একেকটি ব্যাগে একটি করে চারা রোপণ করতে হবে। রোপণের পর কঞ্চি কলম চারার গোড়ায় ধীরে ধীরে পানি ঢালতে হবে যাতে মাটি গোড়াতে চেপে বসে।

চিত্র ঃ পলিব্যাগে কঞ্চি কলম রোপণ।

৬) পলিব্যাগ গুলোকে ছায়ায় স্থাপন

কঞ্চি কলমগুলোকে পলিব্যাগের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং যাতে কলমগুলো বালি থেকে তুলে আনার ধকল সয়ে নেয়, সে জন্য ব্যাগগুলোকে ছায়ায় নিয়ে গিয়ে পাশাপাশি বসিয়ে রাখতে হবে। ব্যাগগুলো ছায়াতে প্রায় ১ সপ্তাহকাল বা ৭ দিন রাখা প্রয়োজন। এ সময়ে চারায় নিয়মিত পানি সেচ দিতে হবে। অতিরিক্ত পানি সেচ করলে গোড়া পচে যেতে পারে। নার্সারি শেডের নিচে এ কাজ করা উত্তম।

৭) পলিব্যাগ গুলোকে রোদে আনয়ন

এখন কঞ্চি কলমগুলোকে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসা ও 'হার্ডেনিং' বা পোক্ত করার জন্য কলমসমেত ব্যাগগুলোকে রোদে নিয়ে আসতে হবে। এই সময়টা মোটামুটিভাবে শ্রাবণ মাসের শেষভাগ হলে ভালো হয়।

৮) কঞ্চি কলমে নতুন কোঁড়ল গজানো

রোদে থাকা অবস্থায় কিছুদিন যাওয়ার পর কঞ্চি চারাগুলোতে নতুন কোঁড়ল গজাবে। নতুন কোঁড়ল গজাতে দেখলে বোঝা যাবে যে, কলমগুলো মাটিতে ভালভাবে স্থাপিত হয়ে মাটির নিচে পুরোপুরিভাবে কন্দ গজিয়ে গেছে।

ঐ সময়ের মধ্যে নিচে যে শক্ত ও স্বাস্থ্যবান মোথার সৃষ্টি হয়েছে এটা তারই ইঙ্গিত। এই ধরনের চারাকে অফসেট চারার প্রায় সমতুল্য বলা চলে। এমন চারা মাঠে রোপণ করার পর শতকরা প্রায় একশত ভাগই (১০০%) বেঁচে যায়।

চিত্র ঃ নার্সারিতে হার্ডেনিংকৃত কঞ্চি কলম।

৯) চারাগুলোকে মাঠে নিয়ে যাওয়া

চারার ব্যাগগুলোকে বাহক কিংবা টুকরীতে বসিয়ে মাঠে নিয়ে যেতে হবে। এই কাজ যত সাবধানে করা যায় ততই ভালো। তাহলে কোন চারা নষ্ট হবার আশঙ্কা থাকবে না।

১০) মাঠে কলম রোপণ

ক) কলম রোপনের সময়

চারা রোপণের সময় নিয়ে কিছু নিয়ম আছে- যদি বর্ষা দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবেই কেবল ভাদ্র মাসের শেষভাগে চারা রোপণ করা উচিত। নতুবা অপেক্ষা করতে হবে পরবর্তী রোপণ মৌসুমের জন্য। পরবর্তী রোপণ মৌসুমে দেরি না করে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসেই চারা রোপণ করে ফেলতে হবে। এ ক্ষেত্রে রোপণের পূর্বে প্রায় ৮ মাসকাল চারাগুলোকে নার্সারিতে রেখে তাদের যত্ন নিতে হবে। পানি সেচ দেয়া ও আগাছা পরিষ্কার করাই হবে তখন প্রধান কাজ।

খ) বাঁশ রোপণের স্থান নির্বাচন

সাধারণত ডোবা, নালা, খাল ও পুকুরের পাড়ে এবং বাড়ীর আশে-পাশের প্রান্তিক জমিতে বাঁশ চাষ করা হয়। এরকম স্থানে বাঁশ লাগালে অন্যান্য ফসলের সাথে প্রতিযোগিতা করে না, আবার বাঁশের অসংখ্য গুচ্ছ-মূল ও মোথা দিয়ে মাটি আটকিয়ে থাকে এবং ভূমি ক্ষয়রোধ হয়। যেসব জায়গায় নতুন মাটি ফেলা হয়, সেখানে জমির কিনারার দিকে বাঁশ লাগিয়ে ভূমি ক্ষয়রোধ করা একটি উত্তম ব্যবস্থা।

- কখনো কোন গাছের নিচে কিংবা ঘন ছায়াতে বাঁশ লাগানো যাবে না।
- লবণাক্ত জমিতে বাঁশ হয় না।
- জমির উচ্চতা ও ঢাল এমন হওয়া দরকার, যাতে বৃষ্টির পানি না জমে এবং কখনই জলাবদ্ধ অবস্থার সৃষ্টি না হয়।
- অনেকের মতে, বসত-বাড়ীর ধারে কাছে ফলের বাগান ও বাঁশ-ঝাড় সৃষ্টি করতে হলে, তা বাড়ীর উত্তর পাশে স্থাপিত হওয়া উচিত। সেক্ষেত্রে কালবৈশাখী ঝড়ের সময় এসব বাগান বসত-বাড়ীর জন্য 'উইণ্ডব্রেক' বা বায়ু প্রতিরোধক রূপে কাজ করে।
- পাহাড়ী এলাকার বাসগৃহের আশে-পাশে চৌহদ্দির ঢালু স্থানে প্রান্তিক রেখা বরাবর লাইন করে বাঁশ লাগালে, তা থেকে সেখানে কালক্রমে একটি দীর্ঘস্থায়ী বেড়ার সৃষ্টি হবে এবং তা ভূমি ক্ষয়ও রোধ করবে।
- বনাঞ্চলের পাহাড়ী জমির নিচের ঢালে বাঁশ চাষ করা উত্তম।

গ) রোপণের স্থান চিহ্নিতকরণ

- বর্ষা শুরুর সাথে সাথে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে নির্বাচিত স্থানে ৫ মিটার বা প্রায় ১৬ ফুট দূরে দূরে (চারা থেকে চারা ১৬ ফুট এবং লাইন থেকে লাইন ১৬ ফুট) চারা রোপণের স্থানগুলো নির্দিষ্ট করে নিতে হবে। স্থানগুলোকে কাঠি দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে। পাহাড়ী জমির ঢালুতে রোপণের বেলায় কন্টুর লাইনে রোপণের স্থানগুলো পড়বে।
- ৫ মিটার দূরত্বে রোপণ করলে প্রতি একর জমিতে মোট ২০০টি করে বাঁশ ঝাড়ের স্থান সংকুলান হবে।

ঘ) গর্ত তৈরীকরণ ও চারা রোপণ

- চিহ্নিত স্থানগুলোতে গর্ত খনন হচ্ছে পরবর্তী কাজ। গর্তের আকার নির্ভর করবে চারার আকারের উপর।
- মোথা বা অফসেট, কঞ্চি কলম ও বীজজাত চারা থেকে অনেক বড় হয়। সুতরাং মোথার জন্য গর্ত হবে ৭৫ সেন্টিমিটার বা ২.৫ ফুট গভীর এবং তার ব্যাস হবে ৬০ সেন্টিমিটার বা ২ ফুট।
- কঞ্চি কলম ও বীজজাত চারার বেলায় গর্তের গভীরতা ও ব্যাস যথাক্রমে ৩৮ সেন্টিমিটার বা ১.২৫ ফুট ও ৩০ সেন্টিমিটার বা ১ ফুট।

ঙ) গর্তে সার প্রয়োগ

- গর্ত করার পর পর প্রতি গর্তের মাটির সাথে প্রায় ৫ কেজি পরিমাণ গোবর সার, ১০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০ গ্রাম টি.এস.পি ও ৫ গ্রাম মিউরেট অব পটাশ (এমপি) মিশিয়ে সার মিশ্রিত মাটি দিয়ে গর্ত ভর্তি করতে হবে।

চ) কঞ্চি কলম বা চারা রোপণ

- প্রায় ২ সপ্তাহ পর্যন্ত গর্তগুলোকে ঐভাবে রেখে দিয়ে তার পর গর্তে অফসেট, কঞ্চি কলম বা চারা রোপণ করতে হবে। এই কাজের জন্য গর্তের কেন্দ্র এলাকা থেকে কিছু আলগা মাটি সরিয়ে নিতে হয়।
- কঞ্চি কলম ও চারা রোপণ করতে হবে সোজা সুজি বা খাড়াভাবে, আর অফসেট লাগাতে হবে একটু কাত করে, তাহলে গোড়ার দিকে তাড়াতাড়ি শিকড় বের হবে। চারা রোপণ করে হাত দিয়ে মাটি চেপে দিতে হবে।

- বাঁশ লাগানোর পর খরা থাকলে, প্রতি চারা বা অফসেটের গোড়ায় সপ্তাহে অন্তত ২ দিন এক কলস করে পানি সেচ দেওয়া দরকার। লক্ষ্য রাখতে হবে চারার গোড়ায় যেন পানি না জমে।

- পাহাড়ী জমিতে বাঁশ লাগানোর পর গোড়াতে ঢালের নিচের দিকের মাটি কিছুটা উঁচু করে পাড় বাঁধার মত করে দিতে হবে। এভাবে সেখানে বৃষ্টির পানি জমে গোড়ার মাটিতে প্রবেশের সুযোগ পাবে বেশি এবং খরার দিনেও মাটিতে আর্দ্রতা থাকবে।

কঞ্চি কলম পদ্ধতির সম্ভাবনা

উল্লেখ্য যে, গ্রামাঞ্চলের প্রধান বাঁশ-প্রজাতির প্রায় সবগুলোই প্রাকমূল কঞ্চি কলম পদ্ধতিতে চাষ করা সম্ভব। একটি ২০ মিটার দীর্ঘ বারিয়ালা বাঁশে কমপক্ষে ২৫টি কঞ্চি হয়। একটি ঝাড়ে যদি ১০টি বাঁশ থাকে, তবে সে ঝাড় থেকে ২০০ এর বেশি কঞ্চিজাত চারা পাওয়া যেতে পারে। সুতরাং দেখা যায় যে, যে ক্ষেত্রে একটি বাঁশ ঝাড় থেকে ২-৪টির বেশি মোথা বা অফসেট সংগ্রহ করা যায় না, সে ক্ষেত্রে কঞ্চি কলমের মাধ্যমে একই ঝাড় থেকে বিপুল সংখ্যক চারা সৃষ্টি করা সম্ভব।

বাঁশ ঝাড় ব্যবস্থাপনা

চিত্র ঃ বাঁশ ঝাড় ব্যবস্থাপনা।

বাঁশ ঝাড় ব্যবস্থাপনা

বাঁশ ঝাড় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সুস্থ-সবল ও পুষ্ট বাঁশ উৎপাদন করে ভাল বাজার মূল্য পাওয়া যায়। পরিচর্যার ফলে ঝাড় থেকে বেশি সংখ্যক বাঁশ পাওয়া সম্ভব। এতে পারিবারিক চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বাড়তি আয় করা যায়। ব্যবস্থাপনার কাজ ৬ টি ধাপে সম্পন্ন করা হয়।

১। ঝাড় পরিষ্কারকরণ।

২। ঝাড়ে নতুন মাটি প্রয়োগ।

৩। ঝাড়ে সার প্রয়োগ।

৪। ঝাড়ে পানি সেচ।

৫। ঝাড় পাতলাকরণ।

৬। আগাছা, মরা বাঁশ ও পুরানো মোথা অপসারন।

বাঁশ চাষে বিভিন্ন প্রকারের পরিচর্যা

১) আগাছা পরিষ্কারকরণ

চারা রোপণের পর প্রথম ৩-৪ বছর ঝাড়ের গোড়া থেকে আগাছা পরিষ্কার করা দরকার। কারণ আগাছাপূর্ণ স্থানে নতুন বাঁশ সহজে গজাতে পারে না। গজালেও তা সরু ও দুর্বল হয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রে ঝাড়ের পরিপূর্ণ বৃদ্ধি হতে অনেক বেশি সময় লেগে যায়। আবার কোন কোন সময়ে আগাছার চাপে চারা বাঁশগাছ মারা যায়। অপরপক্ষে, বাঁশ ঝাড় সম্পূর্ণরূপে আগাছা বিহীন রাখলে ৪-৫ বছরের মধ্যেই বাঁশ ঝাড় থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বাঁশ আহরণ শুরু করে দেয়া যেতে পারে।

২) সার ও মাটি প্রয়োগ

অন্যান্য গাছপালার মত বাঁশের জন্যও সার প্রয়োগের প্রয়োজন আছে। বাঁশ ঝাড়ের বয়স ও বিস্তৃতি যতই বাড়তে থাকবে ততই সারের পরিমাণ বাড়াতে হবে। কি পরিমাণ সার লাগবে, বিশেষ করে ফসফরাস ও পটাশ-ঘটিত সার কতটা লাগবে, তার জন্য মাটিতে ঐ সব উপাদান কতটা রয়েছে তা যাচাই করে নিতে পারলে ভাল হয়। এর জন্য মৃত্তিকা বিজ্ঞানী ও কৃষি বিজ্ঞানীদের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে মোটামুটিভাবে কোন রাসায়নিক সার কি পরিমাণে দিতে হবে তার একটি পরিমাপ নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

বাঁশ ঝাড়ে সার প্রয়োগের পরিমাণ

সার	বছর অনুযায়ী জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগের পরিমাণমাত্রা							
	৩য়	৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ	৭ম	৮ম	৯ম	১০ম
গোবর/কম্পোস্ট (কেজি)	১৫	২০	২৫	৩০	৩৫	৪০	৪৫	৫০
ইউরিয়া (গ্রাম)	৩০০	৪০০	৫০০	৬০০	৭০০	৮০০	৯০০	১০০০
টিএসপি (গ্রাম)	১৫০	২০০	২৫০	৩০০	৩৫০	৪০০	৪৫০	৫০০
এমপি (গ্রাম)	৬০	৮০	১০০	১২০	১৪০	১৬০	১৮০	২০০

- প্রতি বছর ফাল্গুন-চৈত্র মাসে ঝাড়ের তলার মাটিতে উপর্যুক্ত সার একত্রে প্রয়োগ করতে হবে।
- ঝাড়ের চারদিকের মাটিতে ৪৫ সেন্টিমিটার বা ১.৫ ফুট চওড়া ও ৬০ সেন্টিমিটার বা ২ ফুট গভীর করে নালা কেটে সেই নালায় ঐ সার প্রয়োগের পর মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
- সার প্রয়োগের পর বৃষ্টি না হলে বাঁশ-ঝাড়ে পানি সেচ দেয়া আবশ্যক।
- বাঁশ ঝাড়ে মাটি প্রয়োগও করা হয়। তবে জমিতে বাঁশ লাগানোর প্রথম ৩ বছরের মধ্যে মাটি প্রয়োগের প্রয়োজন নাই। এরপর প্রতি বছরই কিছু পরিমাণ আলগা মাটি দিয়ে ঝাড়ের ভিতরে একটি হালকা স্তর বানিয়ে দিলে ভাল হয়।

চিত্রঃ মাটি ও গোবর সারের মিশ্রণ।

চিত্র ঃ মাটি প্রয়োগের পর বাঁশ ঝাড়।

চিত্র ঃ নতুন গজানো বাঁশসহ ঝাড়।

৩) পানি সেচ ও মালচিং

বাঁশ ঝাড়ের প্রথম অবস্থায় চারা গাছে পানি সেচ দেয়া বিশেষ প্রয়োজন।

- সাধারণত কার্তিক থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত পানি সেচের দরকার হয়।
- প্রথম বছর ১ সপ্তাহ পর পর গাছ প্রতি এক কলস পানি দিতে হবে। পরবর্তী বছরগুলোতে পানির পরিমাণ এক কলস করে বাড়িয়ে ৫ বছর পরে পাঁচ কলস করে পানি দিতে হবে।
- অবশ্য পানির পরিমাণ নির্ভর করবে মাটির আর্দ্রতার উপর। কোন কোন সপ্তাহে পানি সেচ দিতে হবে না, আবার কোন কোন সপ্তাহে কম করে পানি দিলেও চলবে।
- চারার গোড়ায় কচুরীপানা, খড়কুটা, কিংবা ছন দিয়ে ঢেকে দিলে ঝাড়ের তলার মাটি সহজে শুকাবে না এবং তখন সেচের পানির প্রয়োজনও হবে অনেক কম।

৪) আংশিক ছায়া প্রদান

রোপণের পর চারা বাঁশ গাছে প্রথম কয়েক বছর আংশিক ছায়া দিতে পারলে দৈহিক বৃদ্ধি দ্রুত হয়। এ জন্য চারার সারির ফাঁকে ফাঁকে অড়হর, মান্দার ইত্যাদি গাছ লাগানো যেতে পারে, তাতে একদিকে যেমন আগাছা বাছাইয়ের খরচও কিছুটা কমবে, আবার ঐ সব ফসল বা গাছ উৎপন্ন করে কিছু কিছু আয় করাও সম্ভব হবে।

৫) বাঁশ পাতলাকরণ (থিনিং)

কঞ্চি কিংবা বীজজাত চারা দিয়ে বাঁশ রোপণের পর প্রথম দুই এক বছর সেখানে চিকন ও সরু বাঁশ গজায়। এই বাঁশগুলো পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে সরে গিয়ে ঝাড়ে গাদাগাদি অবস্থায় থাকে। এসব মরা বাঁশ কেটে ফেলে না দিলে মাটি থেকে নতুন কোঁড়ল বেরিয়ে আসতে পারে না। এক্ষেত্রে-

- মরা বাঁশগুলো অবশ্যই কেটে ফেলতে হবে।
- বাঁশ কাটার সময় তা একেবারে মাটির গা ঘেঁষে কাটা উচিত।
- মাটির কিছুটা উপরে কাটলে, থেকে যাওয়া গোড়া থেকে নতুন ডালপালার জন্ম হয়ে ঝাড়ে একটা গাদাগাদি অবস্থার সৃষ্টি করবে। তাতে পরিবেশও অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়বে।
- ঝাড়ে বাতাস চলাচল ও আলো প্রবেশ করলে, তা স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করবে এবং এমন পরিবেশ প্রচুর সংখ্যায় নতুন বাঁশ গজাতে ও স্বাস্থ্যবান ঝাড় সৃষ্টিতে সাহায্য করবে।
- বনাঞ্চলের বয়স্ক বাগানে সময়মত থিনিং করে সেখানে প্রাকৃতিকভাবে নিবিড় বাঁশ ঝাড় তৈরিতে সাহায্য করা যায়।

৬) রোগ ও পোকা-মাকড় দমন

ক) রোগের মধ্যে বাঁশের মাথা পচা রোগ প্রধান। এই রোগে ঝাড়ের অধিকাংশ বাঁশের মাথা শুকিয়ে কিংবা পচে ভেঙ্গে পড়ে। অনেক সময় একটি পুরো ঝাড়কে মাথাবিহীন ঝাড় বলে মনে হয়। কান্ডের মরা অংশ ক্রমে বাদামী থেকে ফিকে লাল বর্ণের হয়ে পড়ে। মরা অংশের কিনারায় অনেক ক্ষেত্রে ডোরাকাটা দাগ দেখা যায়। এ রোগ দমনের জন্য ২টি ব্যবস্থা নেওয়া যায়-

- মরা বাঁশ দেখা মাত্র তা ঝাড় থেকে অপসারণ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- ঝাড়ে রোগজীবাণু নাশক ঔষধ ছিটাতে হবে। এ কাজে ডায়থেন এম-৪৫ নামক কীটনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে। ২০ গ্রাম ডায়থেন এম-৪৫ প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে নতুন গজানো কোঁড়ল এবং ঝাড়ের গোড়ার মাটিতে ভালোভাবে স্প্রে করে ভিজিয়ে দিতে হবে।

চিত্র ঃ বাঁশ ঝাড়ে রোগের লক্ষণ সমূহ।

খ) পোকার মধ্যে উঁই পোকার আক্রমণ সর্বপ্রধান। উঁই পোকা দমনের জন্য প্রথমে বাড়ন্ত বাঁশ এর গোড়ার দিকে উঁই এর দ্বারা উঠানো মাটি কোদাল, দা বা অন্য সুবিধা মতো যন্ত্র দিয়ে কাঁচিয়ে ফেলতে হবে। পরে ঐ মাটিসহ পোকাগুলোর উপর ঔষধ ছিটাতে হবে। উঁইপোকা দমনের জন্য হেপ্টাক্লোর, ক্লোর্ডেন, ডায়ালড্রিন, থিওডান ইত্যাদি কীটনাশক প্রযোজ্য। প্রতি লিটার পানিতে ৫ মিলিলিটার হারে কীটনাশক ঔষধ মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। অন্যভাবে পানির সাথে কেরোসিন মিশিয়ে সেচ দিলে উঁই পোকা বাঁশঝাড়ের জমি ত্যাগ করে যাবে।

ঝাড় থেকে বাঁশ আহরণ

আমাদের উদ্দেশ্য বাইরের দিকের কমবয়সী বাঁশ না কেটে ঝাড়ের ভিতরের দিকের পরিপক্ক বাঁশগুলো কেটে কাজে লাগানো। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কিভাবে পূর্ণবয়স্ক ঝাড় থেকে বাঁশ কাটা যেতে পারে তার একটি ধারাবাহিক বিবরণ নীচে দেয়া হলো ঃ

১) পাকা বাঁশ আহরণের দিকে নজর প্রদান

একটি অফসেট, কঞ্চিকলম বা বীজজাত চারা রোপণের পর, তার চারদিকে নতুন বাঁশ গজায়। এই সব নতুন বাঁশের চারদিকে গজায় পরবর্তী বাঁশগুলো। এভাবে নতুন নতুন বাঁশ গজিয়ে যেন একটি কেন্দ্র বিন্দু থেকে ক্রমান্বয়ে বৃত্তের পরিধি বাড়তে থাকে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, ঝাড়ের ভিতরের দিকে বা কেন্দ্রের দিকের বাঁশগুলো বেশি বয়সী ও পোক্ত বা দৃঢ় হয়ে থাকে। সাধারণত ৩ বছর বয়স হওয়ার পর বাঁশের কোষ-প্রাচীরগুলো পুরু হয়ে বাঁশকে দৃঢ়তা প্রদান করে। সচরাচর এই বয়সী বাঁশগুলোকে পাকা বাঁশ বলা হয়। অপরপক্ষে, ঝাড়ের বাইরের দিকের বাঁশগুলো ভেতরের বাঁশের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক লম্বা ও মোটা হয়। যদিও সেগুলো হচ্ছে তুলনামূলক কম বয়সী এবং কোষ প্রাচীরগুলো তুলনামূলক পাতলা ও নরম হয়ে থাকে।

এই অবস্থায় বহু বাগান মালিক একটি বড় রকমের ভুল করে থাকেন। যেহেতু বাইরের বাঁশগুলো দেখতে ভাল এবং সেগুলো কাটতে সুবিধা, তাই ঝাড়ের বাইরের দিকের বাঁশ অধিক পরিমাণে কাটা পড়ে। এর ফলে ঝাড়ের প্রভূত ক্ষতি হয়ে থাকে। যেমন ঃ

- অপেক্ষাকৃত কম বয়সী বা কাঁচা বাঁশ কাটা পড়ে যেগুলো নিম্নমানের হয়।
- ঝাড়ের বাইরের দিকের মোথাগুলো নষ্ট হয়ে যায়।
- ঝাড়ের পরিধি বাড়তে পারে না।

- ভিতরের অংশে পুরাতন বাঁশ থেকে যাওয়া অবস্থায় নতুন বাঁশ গজিয়ে একটি ঠাসাঠাসি অবস্থার সৃষ্টি হয়। সুতরাং যাতে ভিতরের দিকের বয়স্ক ও পাকা বাঁশ কাটা পড়ে এবং বাইরের দিকের কম বয়সী (১-২ বৎসর বয়সী) কাঁচা বাঁশ থেকে যায়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, জমিতে বাঁশ রোপণের পর ৫ বা ৬ বছরের মধ্যে তা পূর্ণাঙ্গ ঝাড়ে পরিণত হয়। ঐ সময়ে প্রতি ঝাড়ে গড়ে প্রায় ১০টি বাঁশ থাকে।

২) ঝাড়ে বাঁশ কাটার পথ তৈরিকরণ

যে ঝাড়টি থেকে বাঁশ কাটা হবে, তার চারদিকে একবার ঘুরে লক্ষ্য করতে হবে, কোন দিকে কম বয়সী বাঁশের সংখ্যা কম রয়েছে। ঐ কম সংখ্যক কম বয়সী বাঁশের এলাকা দিয়ে ঝাড়ের কেন্দ্রের কাছাকাছি স্থানে বিদ্যমান সঠিক বয়সের বাঁশ বা পাকা বাঁশ কাটার জন্য পথ তৈরি করতে হবে। তাহলে কম সংখ্যক নতুন বাঁশ কাটা পড়বে। এজন্য ঝাড়ের পরিধি থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত দু'একটি বাঁশ কেটে পাকা বাঁশগুলো কাটা ও সেগুলো টেনে বের করার পথ করে দিতে হবে।

৩) বয়স্ক বাঁশ কর্তন

ঝাড়ের ভিতরের দিকের অধিকাংশ ৩ বছর বা তদুর্ধ্ব বছর বয়সের বাঁশ কাটতে হবে। তবে সেখানে কিছু বয়স্ক বাঁশ রাখতে হবে। যদি একটি ঝাড়ের ভিতরের দিকে ১০টি বাঁশ থাকে, তাহলে সেখান থেকে ৭টি বাঁশ কেটে বাকি ৩টি বাঁশ রেখে দিতে হবে। এইগুলি যেন একত্রে না থেকে সমগ্র ঝাড়ে ছড়িয়ে থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ঐ বয়স্ক শক্ত বাঁশগুলো সামগ্রিকভাবে ঝাড়কে শক্ত রাখবে এবং এতে ঝড় বাদলে ঝাড়ের ক্ষতি হবে না।

৪) বাঁশ কাটা ও বের করার পদ্ধতি

যে বাঁশে কঞ্চি বেশি, বিশেষ করে সেগুলোর গোড়ার দিকের কঞ্চিগুলো আগে কেটে ফেলতে হবে। এতে ঝাড় থেকে বাঁশ কেটে বের করা সহজ হবে। এক্ষেত্রে-

- কোন নির্দিষ্ট ঝাড়ে যতগুলো বাঁশ কাটা হবে, সেগুলোর সংখ্যা যেন ঐ ঝাড়ে নতুন গজানো বাঁশের সংখ্যার চেয়ে বেশি না হয়। সেক্ষেত্রে ঝাড়টি স্বাভাবিকভাবে বাড়বে এবং সতেজ ও স্বাস্থ্যবান থাকবে। বয়স্ক বাঁশ ঝাড়ের দৈহিক শক্তি বৃদ্ধি করা ছাড়াও এদের অসংখ্য পাতার মাধ্যমে সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ঝাড়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য গ্রহণে সাহায্য করে।
- কোন বাঁশ কাটার সময়, বাঁশটির গোড়ার কাছাকাছি যে পর্বটি আছে ঠিক তার উপরে তির্যক করে কেটে, তাকে গোড়া থেকে আলগা করতে হবে। তাতে বাঁশের গোড়ার অংশ খুব কমই থেকে যাবে এবং তির্যক করে কাটার কারণে কাটা স্থানে বৃষ্টির পানি জমবে না এবং কাটা স্থানটি পোকা-মাকড় ও ছত্রাকের আবাসস্থলে পরিণত হতে পারবে না।

৫) বাঁশ কাটার মৌসুম

- কার্তিক থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত বাঁশ কাটা যায়। কার্তিক থেকে পৌষ মাসে বাঁশে সঞ্চিত খাদ্যের অর্থাৎ শর্করা জাতীয় পদার্থের পরিমাণ কম থাকে। সে সময়ে যে সব বাঁশ কাটা হয় সেগুলোতে ঘুন কিংবা ছত্রাকের আক্রমণের সম্ভাবনা কম থাকে।
- জ্যৈষ্ঠ থেকে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত বাঁশ কাটা উচিত নয়। এটি বাঁশ গজানোর মৌসুম। এ সময়ে বাঁশ কাটলে কাটার সময়ে বাঁশের সদ্যজাত কোঁড়লগুলো ভেঙ্গে যাবারও আশঙ্কা থাকে।
- যে বছর ঝাড়ে ফুল ও বীজ হয়, সে বছর বীজ সংগ্রহের পরই কেবল বাঁশ কেটে ফেলা যেতে পারে। তার আগে নয়। বীজ সংগ্রহের সুযোগটি হাতছাড়া করা উচিত নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বীজ থেকে চারা তৈরি করে অতি সহজে কম খরচে নতুন বাঁশের বাগান করা যায়।

৬) বাঁশ কাটার পরবর্তী কাজ

- বাঁশ কাটতে যে-সব কঞ্চি ও ডালপালা ফেলা হয়, কাজ শেষে সেগুলো পরিষ্কার করে সরিয়ে ফেলা উচিত।
- বনাঞ্চল হতে বাঁশ আহরণের সময় প্রায়ই বাঁশের আগার দিকের ৩/৪ মিটার এবং গোড়ার দিকের ২/১ মিটার পরিমাণ অংশ বনে ফেলে আসা হয়। অথচ এই অংশগুলো বেশ মূল্যবান সম্পদ। বিশেষ করে আগার দিকের অংশে সেলুলোজ ও ফাইবার বেশি থাকে বলে তা দিয়ে ভাল মন্ড তৈরি করা যায়। সুতরাং এগুলো সংগ্রহ করে এনে কাজে লাগানো উচিত।
- ঝাড়ের ভেতরের মরা ও পচা বাঁশ এবং কাটা বাঁশের গোড়ার মাটি খুঁড়ে তুলে ফেলে দিতে হবে। জায়গাটি ৩ ভাগ মাটির সাথে ১ ভাগ জৈব সার (পচা গোবর, পচা কচুরীপানা কিংবা ধানের তুষ) মিশিয়ে ঢেকে দিলে পরের বছর ঝাড়ের ভিতরেও নতুন বাঁশ গজাবে। ঝাড় থেকে বাঁশ কাটার এই পদ্ধতিতে 'হর্স-সু কাটিং' বা 'অশ্বক্ষুরাকৃতি কর্তন' পদ্ধতি বলা যেতে পারে।
- এই পদ্ধতি সব প্রজাতির জন্য প্রযোজ্য নয়। বনাঞ্চলের মুলি বাঁশের ঝাড় থেকে নির্বাচনের ভিত্তিতে কেবল বয়স্ক বাঁশ কাটা উচিত। তবে শতকরা ১৫-২০ ভাগ বয়স্ক বাঁশ ঝাড়ে রেখে দিতে হবে যাতে করে এরা সবুজ পাতার মাধ্যমে খাদ্য প্রস্তত করে ঝাড়কে শক্তি প্রদান করতে পারে।

উৎপাদনের আয়-ব্যয়

বাঁশ চাষের আয়-ব্যয় প্রধানত চারার প্রকার, পরিচর্যা, সার প্রয়োগ, প্রজাতি এবং সর্বোপরি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কর্মচারি অথবা শ্রমিক নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে। প্রচলিত প্রথায় মোথা বা অফসেট রোপণ এবং আধুনিক প্রথায় কঞ্চি কলম কিংবা বীজ উদ্ভূত চারা রোপণ এই ২টি পদ্ধতির উৎপাদন ব্যয়ে সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। বিশেষ করে প্রাথমিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে চারার প্রকার দ্বারা যে ব্যবধান হয়ে থাকে তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেবল এই একটি ব্যয়ই কোন চাষিকে বাঁশ চাষে উৎসাহিত কিংবা নিরুৎসাহিত করার জন্য যথেষ্ট।

এখানে বাঁশ চাষের আয়-ব্যয়কে প্রধানত ২টি ভাগে দেখানো হলো। যথা- (১) চারা বা রোপণ সামগ্রী উৎপাদন ব্যয় এবং (২) চাষ বাবদ ব্যয়। ব্যয়গুলো বাইজ্জ্যা কিংবা মাকলা বাঁশকে ভিত্তি করে হিসাব করা হয়েছে।

১) চারা বা রোপণ সামগ্রী উৎপাদন ব্যয়

প্রাথমিক ব্যয় চারা সংগ্রহ অথবা চারা প্রস্তুতকরণ থেকে গর্তে চারা রোপণ পর্যন্ত ব্যয়ে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। এই ব্যয় চারার প্রকারের উপরে বিশেষভাবে নির্ভরশীল। যেখানে একেকটি মোথা বা অফসেট এর জন্য প্রাথমিক ব্যয় প্রায় ৯৩০ টাকা, সেখানে কঞ্চি কলম কিংবা দাবাকলমের জন্য প্রায় ৩০ টাকা এবং বীজের চারার ব্যয় ২৫ টাকার মত। প্রচলিত পদ্ধতিতে অফসেটের মূল্য, ঝাড় থেকে সংগ্রহের ব্যয়, পরিবহণ ব্যয়, গর্ত তৈরি করে রোপণ ইত্যাদি সর্ব বিষয়েই অবিশ্বাস্য রূপে ব্যয় সাধিত হয়। কঞ্চি কলম ও বীজের চারার বেলায়, নার্সারিতে চারা তৈরি করে নেওয়ার ব্যয় সত্ত্বেও সেগুলোর জন্য অতি অল্পই ব্যয় হয়ে থাকে। এখন এই ব্যয়কে ১ একরে রূপান্তরিত করে দেখা হলো।

প্রতি একর ৫ মিটার দূরত্বে বাঁশ রোপণ করলে মোট ২০০টি চারার প্রয়োজন। জমিতে চারা রোপণের পর গড়ে ১০/১৫টি চারা মারা যেতে পারে। পরিবহন, রোপণ, পরিচর্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ত্রুটির কারণে এমনটি ঘটতে পারে। সে জন্য ১ একর জমিতে ২০০টি চারা বাঁচানোর জন্য ১৫% খরচ বাড়তি ধরা হলো। এখন প্রতি একরে প্রাথমিক খরচের জন্য নিম্নে একটি হিসাব দেখানো হলো–

১ একর জমিতে বাঁশ রোপণের প্রাথমিক ব্যয় (টাকা)।

চারার প্রকার	চারা প্রতি ব্যয়	২০০ চারার ব্যয়	১৫% বাড়তি ব্যয়	মোট ব্যয়
মোথা/অফসেট	৯৩০/-	১,৮৬,০০০/-	২৭,৯০০/-	২,১৩,৯০০/-
কঞ্চি কলম	৩০/-	৬,০০০/-	৯০০/-	৬,৯০০/-
বীজের চারা	২৫/-	৫,০০০/-	৭৫০/-	৫,৭৫০/-

উক্ত হিসাব অনুযায়ী ১ একর জমিতে মোথা বা অফসেট রোপণ করতে ২,১৩,৯০০/- টাকা খরচ পড়ে। অপর পক্ষে কঞ্চিকলম লাগাতে মাত্র ৬,৯০০/- টাকা এবং বীজের চারা লাগাতে ৫,৭৫০/- টাকা খরচ পড়ে। সুতরাং যে কোন চাষি অফসেটের পরিবর্তে কঞ্চিকলম কিংবা বীজের চারা রোপণ করতে উৎসাহিত হবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রকৃতপক্ষে বীজের চারার চাহিদা সবচেয়ে বেশি হওয়ার কথা। তবে বাঁশে ফুল ধরে বীজ হওয়াটা সহজ কিংবা সচরাচর ঘটে না এবং বীজের চারা থেকে পূর্ণাঙ্গ বাঁশ হতে বেশি সময় লাগে। সুতরাং সকল দিক বিবেচনায় কঞ্চি কলমের চারাই সকলের কাম্য।

২) বাঁশ চাষের আয়-ব্যয়

বাঁশ চাষের আয়-ব্যয়ের হিসাব মাঠের শস্যাদির চেয়ে ভিন্নতর। কেননা বাঁশ এক বর্ষজীবী শস্যের মত মৌসুম বা বছর শেষে শস্য উৎপাদন করে না। বাঁশের তুলনা চলে বহু বর্ষজীবী ফলদ বৃক্ষের সাথে। আম-কাঁঠালের বেলায় যেমন রোপণের পরবর্তী কয়েক বছর ধরে কেবল খরচ করে যেতে হয়, বাঁশের অবস্থাও তেমন। বাঁশ চাষেও চাষিকে ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করতে হয় সেদিনটির জন্য যখন থেকে বাঁশ কাটা শুরু হবে। রোপণের পঞ্চম বছর থেকে ঝাড় থেকে প্রথম বাঁশ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। এর আগে বাঁশ কাঁচা থাকে এবং তা দৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। একবার কোন ঝাড় থেকে বাঁশ সংগ্রহ শুরু হয়ে গেলে, ৩০/৪০ বছর ধরে প্রতি বছরই সেখান থেকে বাঁশ কাটা যায়। সুতরাং বাঁশ চাষের আয়-ব্যয় সঠিকভাবে বোঝার জন্য রোপণ থেকে শুরু করে সংগ্রহ পর্যন্ত বছরগুলোর হিসাব টানা প্রয়োজন। তবে প্রথম ১০ বছরের পর ঝাড়ের ব্যয় ও তা থেকে আয় প্রায় একইরূপ (১০ বছরের মত) থাকে। যেহেতু বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট তাদের গবেষণায় বাঁশ চাষের জন্য চারা রূপে কঞ্চি কলমকেই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বলে লক্ষ্য করেছে, সুতরাং প্রচলিত মোথা বা অফসেট ব্যবহারের পরিবর্তে কঞ্চি কলমের মাধ্যমে বাঁশ চাষের জন্য উন্নত পদ্ধতি অনুসরণ করার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

- **প্রথম ৫ বছরের আয়-ব্যয়**

একাধারে ৪ বছর ধরে ব্যয় করার পর ৫ম বছরে প্রথম বাঁশ কাটার মাধ্যমে আয় আসা শুরু হয়। প্রথম ৫ বছরে মোট যা ব্যয় হয়, ৫ম বছরে একটি ঝাড় থেকে মাত্র ৩টি বাঁশ কেটে বিক্রি করেই তার চেয়ে বেশি আয় করা সম্ভব হয়।

- **দ্বিতীয় ৫ বছরের আয়-ব্যয়**

পরবর্তী ৫ বছরে, প্রতি বছর পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় অতি সামান্য পরিমাণে ব্যয় বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে, আয় বাড়তে থাকে বিপুল পরিমাণে। কেননা, ঐ সময়ে প্রতি বছর পূর্ববর্তী বছর অপেক্ষা অন্তত একটি করে বেশি বাঁশ কাটা সম্ভব হয়। তাতে ১০ম বছরে ৮টি বাঁশ কাটা যায়। ১১তম বছরে এবং পরবর্তীকালে ১০ম বছরের পুণরাবৃত্তি ঘটে।

চাষ বাবদ আয়- ব্যয় (একর প্রতি)

আনুমানিক ব্যয়

চারার প্রকৃতি	ব্যয়ের খাত	চারার সংখ্যা	ব্যয়	মোট ব্যয় (টাকা)
টিস্যুকালচার/ কঞ্চি কলম	১. চারা তৈরি বাবদ	২০০টি	২৫ টাকা/ চারা	৫,০০০/-
	২. চারা লাগানো বাবদ (১ একর)		৫,০০০/ -	৫,০০০/-
	৩. পরিচর্যা বাবদ (প্রথম ৩ বছর)		৬,০০০/ -	১৮,০০০/-
			৩ বছরে মোট ব্যয়	= ২৮,০০০/-

আনুমানিক আয়

বছর	প্লট	ঝাড় সংখ্যা	কর্তনযোগ্য বাঁশের সংখ্যা/ঝাড়	মোট কর্তনকৃত বাঁশের সংখ্যা/ঝাড়	আনুমানিক বাজার দর (টাকা)	মোট আয় (টাকা)
১ম	১	৬৬টি	৫টি	৩৩০টি	১৫০/-	৪৯,৫০০/-
২য়	২	৬৬টি	৫টি	৩৩০টি	১৫০/-	৪৯,৫০০/-
৩য়	৩	৬৮টি	৫টি	৩৪০টি	১৫০/-	৫১,০০০/-
					৩ বছরে মোট আয়	= ১,৫০,০০০/-

উপসংহার

বাঁশ পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল একটি উদ্ভিদ। কাঠের বিকল্প এবং বহু খাদ্যের উৎস হিসেবে বাঁশের ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে বাঁশ একবিংশ শতাব্দীর একটি উদীয়মান গুরুত্বপূর্ণ শস্য হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে। ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণ, দারিদ্র বিমোচন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়নে বাঁশ চাষ সম্প্রসারণ জরুরী। কেবলমাত্র বিজ্ঞানসম্মত ভাবে ব্যাপক বাঁশ চাষের মাধ্যমে আগামী দিনের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে।

যোগাযোগ : বিভাগীয় কর্মকর্তা, সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগ
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
টেলিফোন : +৮৮ ০২ ৩৩৪৪৮১৫৭২, ই-মেইল : dosgd@bfri.gov.bd ওয়েবসাইট : www.bfri.gov.bd